কবি

লিটিল কবিতাপত্র

বৈশাখ সংখ্যা'২০২২

নবজীবনের নবচেতনায়

সম্পাদক
র. আমিন

প্রচ্ছদ
সংগৃহীত

প্রকাশক
Amazon.com Inc., USA

সম্পাদকীয়

বাংলা নববর্ষের শুভেচ্ছা রইলো সবার প্রতি।

নববর্ষ অতীতের সকল দুঃখ, গ্লানি, হতাশাকে বিতাড়িত করে এক নব জীবনের যাত্রা শুরু করে। নববর্ষে আমরা সব সময় নতুন সাঁজে সজ্জিত হই। দিনটি উদযাপনের জন্য আমরা বিভিন্ন অনুষ্ঠান সম্পন্ন করি । জাতি-ধর্ম- গোত্র নির্বিশেষে আমরা সকলে একসাথে উৎসবের আমেজে মেতে ওঠি। নববর্ষের মাধ্যমে আমরা আমাদের কৃষ্টি ও ঐতিহ্যকে বিশ্বের কাছে তুলে ধরতে পারি । নববর্ষ হলো পারস্পারিক সুখ সমৃদ্ধি কামনা। ধর্ম- গোত্র- বর্ন নির্বিশেষে সকলে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে চলা। এই চেতনাকে ধারণ করে আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস- **বৈশাখ সংখ্যা'২০২২**।

কবিতা

আরণ্যক বসু - ৪
ওরে সবুজ

আহমেদ মাসুদ ইকবাল - ৫
নব প্রভাতে তোমারেই চাই

কাবেরী আক্তার - ৬
বৈশাখী মেলা

তাপসী দত্ত - ৭
বৈশাখী স্মৃতি

মনজুর রশীদ - ৯

শঙ্কর তালুকদার - ১০
পুরানো গ্লানীর শেষে নববর্ষ

শামস ই ইলাহি - ১০

হিমাদ্রি বড়ুয়া - ১১
হিমুর ঘাম

গল্প

মোজাম্মেল কবির - ১২
সোনার আংটি

ফাহমিদ ইসলাম -১৬
আবুল-এর কুকুর ও শেয়াল

প্রবন্ধ

কাজী মিরা -১৮
নববর্ষে মিষ্টিমুখ

প্রতিভা চৌধুরী - ১৯
বৈশাখের গান

নাটক

র.আমিন - ২০
বৈশাখী মেলা

ফটোগ্রাফি

শাহরিনা চৌধুরী - ২৩
বৈশাখী ফটোগ্রাফি

কবিতা

আরণ্যক বসু
ওরে সবুজ

দেড় পয়সার কবি চলেছে
বেলপাহাড়ির বাসে
একটু মেঘলা, একটু দুষ্টু,
সেদিন চৈত্র মাসে

ব্যাগ গোছাও গো শ্যামলিমার
অবাক মেয়েবেলা
মন্দাক্রান্তা , অনুস্‌টুপের
গহন গভীর খেলায় !

মুঠোয় দেবো মহুয়া ফুল
চোখে সর্বনাশ
কলকাতাকে দুয়ো দেবো
ঘাস বিচালি ঘাস

অন্তরাতে চিবুক ছোঁবো
সঞ্চারীতে মায়া
পরের জন্মে গান হয়ে তোর
জড়িয়ে ধরবো ছায়া

কবি হয়তো হবো না আর
পলাশ শিমূল ঘিরে
অভিমানের টাটকা ক্ষত
দেখিস সে বুক ছিঁড়ে !

আপাতত থাক বিতর্ক
দ্যাখো, আসমান ডাকে
পলাশ গাছটি ফুসলিয়ে দেয়
দুরন্ত মৌচাকে !

দেখতে দেখতে বাস পেরোলো
রূপনারাণের জল
ওরে সবুজ, কবে পাবো রে ,
অতল বুকের তল !

আহমেদ মাসুদ ইকবাল

নব প্রভাতে তোমারেই চাই

গত বৈশাখে তুমি এসেছিলে,
নতুন কেতন হাওয়ায় উড়িয়ে !
আজ তুমিই পুরাতন হয়ে গেলে-
হে পুরাতন ! আজ তোমাকে বিদায়।
কমতো নয়, পুরো বারোটি মাস-
তুমিই-বিরাজিত ছিলে-
এই আমাদের সভায়।
আমাদের আশাজাগানিয়া জীবনে-
কালবৈশাখী ঝড় হয়ে-
তুমি এসেছিলে আনন্দের-
নব ধারা লয়ে।
আশা নিরাশার দোলায় দোলে-
জীবনের দিনগুলি,
পাড়ি দিয়েছে পথ-
এক দুই গুণে গুণে-
সপ্তাহ পেরিয়ে মাস,
আর মাস পেরিয়ে-
গোটা একটি বছর।
মেয়াদ শেষে নতুনের আগমনে-
বিদায় তোমাকে নিতে হবে তাই,
আজ এই বৈশাখের নব প্রভাতে-
হে পুরাতন তোমাকে বিদায়।
ঝড় হয়ে এসেছিলে তুমি,
আজ সেই তুমিই-
পড়েছো ঝড়েরই মুখে !
জেগেছে ধরা আজ প্রাণ উল্লাসে,
নতুন দিনের সূর্য ঢালিছে কিরণ-
পৃথিবীর বুকে নব উদ্যমে।
হে পুরাতন তোমাকে ধরে রাখবার-
নেইতো কোনই উপায়,
তাই এই বৈশাখেই তোমাকে বিদায়।
কাজল কালো মেঘেরা-
আজ বাতাসে তুড়ি মেরে-
দখল করেছে অম্বর,
প্রলয় অভিলাষে।
রুদ্রমূর্তি ধরে বাতাস,
ঝেঁটিয়ে নিয়ে যাবে-
পুরাতন যত আছে সব।

দুর্নিবার ঝড়ের মুখে-
তুমিও ঠাঁই পাবে ওই,
পুরাতনেরই মাঝে।
আজ নব বৈশাখের-
সাড়ম্বর আগমনে।
বৈশাখী প্রলয় নৃত্যে হে পুরাতন,
তোমার এই বিদায়ের বেলা-
সমর্পিত হোক - আজিকার
এই নতুন বৈশাখেরই কাছে।
মুখরিত হোক নতুনের যাত্রা,
প্রাণ থেকে প্রাণে-
বর্ষবরণের গানে।
আনন্দ জাগুক ঘুম ভাঙা
ভোরের পাখির গানে,
এই পৃথিবীর প্রতিটি প্রাণে।
ডাকুক সাগর - ছুটে যাক নদী৷
উঠুক তুফান - ঝড় জলধি৷
উপেক্ষিয়া উঠুক - কুসুম কুঞ্জে-
বৃষ্টিস্নাত কুসুমের হাসি।
মিশে যাক সে হাসি আজ,
সকলের হাসির সাথে।
প্রার্থনা শুধু আমাদের জীবন নদীর
বাঁকে-বাঁকে আছে যত-
পুরাতন দিনের না পাওয়ার বেদনা-
যেনো পূর্ণতা পায় - এই বৈশাখে।।

কাবেরী আক্তার
বৈশাখী মেলা

বৈশাখী মেলায়,শুধু ঘুরাঘুরি করি,
কিযে কিনি তা বুঝতে কি ছাই পারি !
এক দোকানে চুড়ি,আরেক দোকানে শাড়ি,
ঘুর-ঘুর-ঘুর চরকি ঘোরায়, ছোট্ট খোকা-খুকি।
দাদু দেখো, বেলুন উড়ায়,নাগরদোলায় বসি।
হাতে রঙের ছাপ দিয়ে ঐ,নতুন বৌ'টি খুশি।
একদিকে তে ভাঁজছে পাকর,পাশেই জিলিপি।
হাওয়াই মিঠাই খেয়ে যখন, হচ্ছে সবার গাল লাল,
রিংকু সোনার চপ খেয়ে, লাগলো তখন ঝাল।
গান গেয়ে আসর জমায়,বয়াতিদের দল,
পুতুল নাচের ঘরে এবার,তোরা সবাই চল।
এমন করেই মেলা আসুক,প্রতিটি বৈশাখে,
এতো রঙিন ঋতু শুধু, আমার দেশেই আছে।

তাপসী দত্ত
বৈশাখী স্মৃতি

মনে পড়ে কতো কথা, হৃদয়ে জড়ানো পাতা !
মেয়েবেলার সেই বৈশাখী স্মৃতি !
দিন যায় যায় দিন, স্মৃতি তবু অমলিন
পাতার ভাঁজে ভাঁজে, ছোট বড় রঙিন সাজে
মাঝে মাঝে উঁকি দেয়,
আহা ! বৈশাখের প্রথম সেদিন !
নতুনের আগমনে চৈত্র সংক্রান্তি দিনে
উৎসবের আমেজ চলতো পাড়ায় পাড়ায় !
ছত্রিশ রকম রান্না !
নাম কিছু জানি, কিছু জানিনা
মা জেঠীমাদের ক্লেশ
মুখের হাসিতেই হতো শেষ !
রকমারী শাক-সব্জীর ডালা
ছোট-বড় সকলে মিলে ভরতাম
ক্ষেতে, মাঠে,
বাড়ির আনাচে কানাচে ছুটতাম
খোঁজাখুজিতে যে যা পেত
ঘরে ঘরে ভাগ হতো
ফিরে এসে উঠোন তলায়
যার যা নেই,
ঠিক-ঠাক মিলিয়ে নিতাম !
লাউ, কচু,কলমি,বথুয়া
পুঁই, কুমড়া, লাল, পালং
হেলেঞ্চা, সজনে, ডাটা শাক
নাম না জানা আরও কতো
শাক যে খেয়েছি, কিছু মনে আছে
আর কিছু ভুলেছি !
আম,তেঁতুল টক ডাল
ডাটা,পেঁপে,সব্জী ডাল
ছোলা, মটর, মুগ, মাষকলাই
পাঁচ-ছয় রকমের ডাল রান্না হয়েছে !
বিকেল থেকেই কাজের ধুম পড়েছে।
আমরা ছোট যত
রান্না প্রতিযোগীতায় রত
এ বাড়ি ও বাড়ি গিয়ে সামিল হতাম
বৈশাখী নেমন্তন্ন ঠিক পেয়ে যেতাম !
আহা ! আহা ! সেইক্ষণ
মনে বাজে সারাক্ষণ
এক বছরের ভাত অন্য বছর খেয়েছি!

কী সুন্দর সময়ে বেড়ে উঠেছি !
রাতে রান্নাভাতে জল মেশাতে হবে
আউশ না আমন কোন চালের ভাত
পান্তা স্বাদে অতুলনীয়
ঠিক সেটা বুঝে তুলে ধরেছি !
চৈত্রে চড়ক পূজা, বৈশাখি সাজে সাজা
মেলায় মেলায় ঘুরে ঘুরে
খেলনা হাড়ি পাতিল কিনে
নতুন কতো কিছুই না ভেবেছি
নতুন জামা কি আর পেয়েছি !
বৈশাখী ভোর বেলায়
বাড়ি ঘর পরিস্কারে
সকলে লেগে যেতাম
লেপে মুছে মাটির ঘর
রোদ শুকনো কি সুন্দর
বেশ লাগতো রঙিন আলপনায়
সূর্য উঠারও আগে
পাড়ায় পাড়ায় দলবলে
নদী স্নানে একত্রে ছুটতাম !
জেনেছি বৈশাখের আগে
কাঁচা আম খেতে বারণ
যদিও তা জানতাম
তবু ছোট মন সেটা কি আর মানতাম !
ডগা সহ আম নিয়ে
বাগান, ঘাট পাড়া পেড়িয়ে
পদ্মায় যখন পৌছাতাম
সকলের চেহারা চেনা
যেতে-যেতে পথে-পথে
খবরাখবর নিতাম দিতাম।
আম নিয়ে জলে ডুব
আম ডুব্বা খেলতাম
নদীতে স্নান সেরে,
গরম বালি পথ ধরে,
সারি করে সকলে আসতাম।
স্নান সেরে শুদ্ধ হয়ে,
বাড়ির সকলে মিলে
গত বছরের ভাত নতুন বছরে পেতাম !
ইলিশ মাছ !পান্তা ভাতে
শুনিনি,দেখিনি! আমরা কি কখনো খেতাম!
সজনে চচ্চড়ি, কচি কাঁঠালের তরকারি,
সরিষার তেল, কাঁচা মরিচ, লবণ,
পেঁয়াজ ! আঁচার বা টক ডালে
মিষ্টি চালের ভাত,
যখন মাখিয়ে খেতাম

আহা ! কি স্বাদ মরি-মরি!
নেমন্তন্ন বাড়ি-বাড়ি !
তবুও ঠিক ছুটতাম!
দোকানে দোকানে হালখাতা,
জিলাপি, রসগোল্লা, সাথে লুচি, বুন্দিয়া
বিকেলে ঘুরে ঘুরে খেতাম
আর পাঁচ টাকা নিয়েই
বিজয়ী হাসি হেসে
মেলায় ঘুরতে ছুটতাম !
রঙে রঙিন সেই সব
অচেনা আজ, তবুও যা পেয়েছি
তোমাদের জন্য কি আর রেখে গেলাম !

মনজুর রশীদ

চারদিকে আজ বারুদের সোঁদা গন্ধ
কোথায় পাই যে লবঙ্গ বনের হাওয়া
বেদনার ঐ নীল সাগরে পাইনা সুখ ছন্দ
চেতনার কাছে এই ছিলো কি চাওয়া ?

বিশ্বাসগুলো হারিয়ে যেন বৈরিতা শুধু হৃদয়ে
নিঃশ্বাস কেন নিতে পারি না স্বরুপে
পাশবিকতার উল্লাস ধ্বনি মনুষ্যত্বের বিদায়ে
মানবিকতার এ কি পরাজয় বিরুপে !

প্রতিহিংসার মাতম খেলা চারপাশ জুড়ে অদ্য
মিথ্যা ঝুড়ির একি অবিরাম ছলা
ধরণীর বুকে আগমণ যার সদ্য
কিইবা আছে সেই শিশুটিকে বলা ?

বিষণ্নতা ভর করেছে এভাবে তো আর না
বাধার প্রাচীর এই জীবনে আসবেই
আধার ঘরে বসে থাকলেই পার না
দৃঢ় প্রত্যয়ে আলোর রেখা হাসবেই।

শঙ্কর তালুকদার
পুরানো গ্লানীর শেষে নববর্ষ

ঝরা পাতা সব উড়ছে দেখো, চৈত্রের শ্মশানে-
পার হয় সে কালের খেয়াল ও, বসন্ত উজানে -
আসছে দেখি নতুন বছর, তাঁকে যত্নে রেখো -
সত্যির মাঝেই স্বপ্ন ভ'রে- সবাই ভালো থেকো !
এমনইতো নূতন আসে - প্রতি বছরেরই শেষে-
সাগর থেকে বর্ষা ও পাহাড় থেকে- শীত আসে,
নতুন বছর প্রতিবারইতো- সম্ভাবনা বয়ে আনে,
আশা-নিরাশায় বছর এমনই ফুরায় অবশেষে !
নূতন আলোর স্বপ্ন যে জাগে, সম্ভাবনার আশে-
ধ্বংস লীলাও সঙ্গে আসে , নিরাশার নাগপাশে;
বিশ্বজুড়ে সম্ভাবনা, আর এগিয়ে যাবার লড়াই-
নববর্ষ যেন নবীকরণ, সকল গ্লানি শেষের ঠাঁই !

শামস ই ইলাহি

এই বোবা রাতে তবু মধুময়,
ভাষা দিলে একই সাথে
কত কথা বলে যাই,,
কত মেঠো ফুল তুলে এনে
মালাটি সাজাই।
এখনই ডেকোনা বিধাতা।
এখনও হয়নি ভোর।
ডাকেনি ভোরের পাখী,
জাগেনি কিষাণ বধূ,
পাতা ঝরা আঙ্গিনাতে।
স্বাগত জানাতে এক নুতন সূর্যকে।
এখনি ডেকোনা বিধাতা।

হিমাদ্রি বড়ুয়া
হিমুর ঘাম

ভুলা মন মোর ছাড়ে না পিছু,
সারাক্ষণ করি ছুটোছুটি নিয়ে একটা কিছু।
ক্লান্ত শ্রান্ত শরীর তখন,
তোমাকে খুঁজে ওহে প্রিয়জন !
খুঁজতে খুঁজতে শুকিয়ে যায়
জবজবে মোর শরীরের ঘাম ;
আনফিটের গন্ধ তখন ভীত-সন্ত্রস্ত
যখন নিই তোমারি নাম।
শীতে তোমার ছিল সখ্যতা
আমার মোজার সাথে,
পাদুকা খুললেই ছড়িয়ে দিতে সুবাস
সন্ধ্যে কিংবা রাতে।
ওহে ঘাম;
তুমি আছো বলেই আমার -
আজ এতই সম্মান!

গল্প

মোজাম্মেল কবির
সোনার আংটি

স্বামী তার দেবরের মতো নেশা পানি খেয়ে বাড়ি ফিরে না । রাত দুপুরে বাড়ি ফিরলেও জাহানারা নিশ্চিন্ত থাকে । সাত বছরের সংসার জাহানারার। মেয়ের বয়স চার বছর। পেটে সাত মাসের সন্তান। মাস দুয়েকের মধ্যে আল্লাহ চাইলে চার জনের সংসার হবে। সংসারের বয়স বাড়ার সাথে সাথে স্বামী স্ত্রীর ভালোবাসার ধরন বদলাতে থাকে। এই সাত বছরে স্বামী 'তুমি থেকে তুই' ডাকে নেমে এলেও প্রেমে ভাটা পরেনি একরত্তি। যখন তখন রাগ একটু বেশী করে। বউ আর কন্যা হাফিজুলের জীবন। সিগারেটের নেশা ছাড়া আর কোন বাজে নেশা নই। ছোট ভাই আজিজুলকে পড়ালেখা করিয়ে মালয়েশিয়া পাঠায় হাফিজ। বছর দশেক সেখানে কাজ করে ফিরে আসে। ভালোই টাকা পয়সা করেছে। গ্রামে বেশ নাম-ডাক। ধান চালের আড়ত, গোটা দশেক অটোরিকশা, বেশ জমি জমাও কিনেছে। মিছিল মিটিংয়েও দেখা যায় আজকাল। শোনা যাচ্ছে সামনে মেম্বার পদে নির্বাচন করবে। বড় ভায়ের এই সবে তেমন আগ্রহ নেই। ভাইকে বিয়ে করিয়ে সংসার আলাদা করে দিয়েছে। তার কথা-নিজের সংসার নিয়ে সুখে থাক। তোর কামাই তুই খা। লোকে যাতে না কয় ছোট ভায়ের কামাই খায় হাফিজুল। আজিজুলের বউটা প্রায়ই দিনের বেলা জাহানারার কাছে এসে কান্নাকাটি করে। আনেক চাপ দেয়ার পর জানতে পারে আজকাল তার দেবর মাঝে মাঝে বাইরে রাত কাটায়। জাহানারার তাই অভাবের সংসারেই যেন স্বর্গসুখ।

এক... দুই... তিন... দরজায় পর পর তিনটা টোকা দিলে জাহানারা বুঝতে পারে স্বামী বাড়ি ফিরেছে। টোকা দেয়ার ধরন বেশ পরিচিত। অন্য কেউ টোকা দিলে সহজেই বুঝতে পারে। শীতের রাতে বাড়ি ফিরে কাঁথার নীচ থেকে এই ভারী শরীর নিয়ে জাগাতে খারাপই লাগছে। তাই দ্বিতীয় বার টোকা দিতে শব্দটা নীচু হয়ে আসে। প্রথম টোকাতেই জেগে উঠে জাহানারা, দরজা পর্যন্ত আসতে দেরী হয়। ম্যাচের কাঠিতে কুপি ধরিয়ে দরজা খুলে দেয়। এক মাসের বিদ্যুৎ বিল বাকী থাকায় লাইন কেটে দিয়েছে। দরজা খুলে জাহানারা কুপি হাতে নিয়ে রান্না ঘরের দিকে যেতে থাকে।
হাফিজুল জিজ্ঞেস করে,
-কই যাসরে জাহান ?
-হাত মুখ ধুইবা পানি গরম কইরা দেই। জাহানারা বলে।
-নারে এতো রাইতে কষ্ট কইরা পানি গরম করার দরকার নাই। তুই যা শুয়া পর। আমি কলে চাপ দিয়া কিছু পানি ফালায়া পানি তুইল্যা লই। তাইলে কুসুম গরম পানি উঠে।
হাফিজুল হাতের টর্চ মেরে গোয়াল ঘরে দুইটা হালের বলদ দুইটা গাভী আর ছাগল তিনটা দেখে নেয়। কপালে ভাঁজ পড়ে। শেষ পর্যন্ত সংসার খরচ চালাতে হালের বলদে হাত দিতে না হয় আবার ! মেয়েটাকে আগামী মাসে স্কুলে ভর্তি করতে হবে। জাহানারা ঠিক করেছে তখন একটা ছাগল বিক্রি করে দিবে। গোয়াল ঘরের অর্ধেকটা জুড়ে বাধা কপি। প্রায় মাস খানেক ধরে অবরোধ হরতালে ঢাকা শহরে গাড়ি যাচ্ছে না ঠিক মতো। এক টাকা দরে কপি কিনে নেয়ার মতো পাইকার নেই। আড়তে নিয়ে গেলে বেচা বিক্রি তো হয়ই না যে দরে বিক্রি হয় তাতে ভ্যান গাড়ির ভাড়া উঠে না। তারচে গরুকে খাওয়ালে লাভ।
মাঘ মাস চলে যাচ্ছিলো, ধার কর্জ করে শেষ সম্বল দেড় বিঘাতে বোরো লাগিয়ে দিয়েছে। ফসল উঠার আগে মাস চারেক সংসার খরচ নিয়ে চিন্তা হাফিজুলের। মহাজনের পাওনা টাকার চাপ নেই কিন্তু ঘরে চুলা তো জ্বালতে হবে। মহাজন শুক্কুর চাচার প্রস্তাবটা মন্দ না। জাহানারার সাথে একটু পরামর্শ করতে চাইছে হাফিজুল।

হাত মুখ ধুয়ে ঘরে এসে হাফিজুল ডানে বায়ে তাকাচ্ছে। জাহানারার কাছে মনে হলো স্বামী কিছু একটা খুজছে। গামছাটা হাতে তুলে দিয়ে বলে -কি খুজতাছো?
-কিছু নারে জাহান। একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে নীরব হয়ে যায় হাফিজুল।
ঘরে একটা আলনা, দুইটা কাঠের চেয়ার, একটা কাঠের আলমারী, একটা টেবিল। ঘুমানোর জন্য একটা পুরনো খাট। সবই তো দরকারি। বিক্রি করার মতো কিছু নেই। জাহানারা ঠিক বুঝতে পারে স্বামী কিছু একটা খুজছে যা বিক্রি করে অন্তত হাজার খানেক টাকা পাওয়া যাবে। আগামী কাল চাল ডাল না কিনলে চুলায় আগুন জ্বলবে না। বিছানায় বসে ভাতের থালায় হাত দিয়ে হঠাৎ চোখ বড় করে তাকায় হাফিজুল। চোখে ভরসার চমক।
বউকে বলে,
জাহান আমার একটা সোনার আংটি আছিলো না ?
-হ আছে তো। কি করবা? হাতে দিবা?
-কি যে কস তুই! সোনার আংটি হাতে দিয়া কি হইবো? ভাবতাছিলাম বিক্রি করলে...
-কি যে কও, এই আংটি তোমারে বেচতে দিমু না। ব্যবস্থা একটা আছে।
-কি ব্যবস্থা ?
-আগে ভাত খাও পরে কইতাছি।
-কথাটা তরে কইনাই, শুক্কুর চাচা একটা প্রস্তাব দিছে। মন্দ না। তিন চাইর মাস কামডা করলে বোরো উঠার আগ পর্যন্ত ভাতের চিন্তা নাই।
-কি কাম?
-রাইতের বেলা ঢাকায় যে তরিতরকারির ট্রাক যায় সেইখানে হেল্পারের কাম।
-তুমি ট্রাক হেল্পারের কাম করবা?
-তাতে কি ? কাম কোনডাই ছোড না। তা ছাড়া রাইতের বেলা কেডা দেখতে যাইবো ? দেখলেই ক্ষতি কি ? - -
- আমিতো মানুষ ঠকাইতে যামু না!
-না হেইডা কই নাই। যেই কাম কোন দিন করো নাই... জাহানারার চোখ জলে ছলছল করছে।
-আরে কান্দস কে? কান্দনের কি অইলো? দুঃখের সময় কানলে দুঃখ বাইড়া যায়। সুখের সময় কানবি তাইলে সুখ বাড়বো।
জাহানারা আরও শব্দ করে কাঁদতে থাকে। চোখ মুছে জাহানারা আলমারির নীচের পাল্লাটা খুলে মাটির ব্যাংকটা এনে দেয় হাফিজুলের সামনে। এক টাকা,দুই টাকা, পাচ টাকার কয়েন সঞ্চয় করে এতে। প্রতি বছর রোজার ঈদের দুই দিন আগে মাটির ব্যাংক ভেঙ্গে এই জমানো টাকায় নতুন জামা কাপড় কিনে। এই পর্যন্ত খুব বেশী জমেনি। হয়তো পাচ ছয়শ টাকা হবে।
হাফিজুল বলে -এইটা আনছস কে?
-বিপদের সময় কাজে না লাগলে টেকা জমাইয়া লাভ কি ? কাইলকা বাজার সদাই নিয়া আসো।
হাফিজুলের কন্ঠে জোর নেই। অভাবের সময় মানুষের মনের জোর কমে যায়। হাফিজুল আপন মানুষের কাছে আত্মসমর্পনে লজ্জার কিছু দেখছে না।
জাহানারা স্বামীর বাম হাতটা টেনে মধ্যমায় সোনার আংটি পড়িয়ে দেয়। হাফিজুল শুধু তাকিয়ে থাকে। কুপির আলোতে শ্যামলা বউটা দেখতে লাল মনে হচ্ছে। চোখের কোনে জমে থাকা জল কুপির আলোয় চিক চিক করছে। এক ফোঁটা পূর্ণ হলে টপ করে ঝড়ে পরতো। আধ ফোঁটা জল।
-ট্রাকে কাম করবা ? পথে কতো আপদ-বিপদ হইতে পারে। তখন বেইচ্যা দিও। জাহানারা আঁচলে চোখ মোছে।

নদীতে এই দিনে বেলে মাছ ধরা পরে। খুব ভোরে হাফিজুল নদী থেকে বেশ বড় সাইজের কিছু বেলে মাছ ধরে আনে। মাটির ব্যাংকে ছয়শ তেতাল্লিশ টাকা জমা হয়েছিলো। চাল-ডাল কিনে শ'দুয়েক টাকা হাতে আছে। ঘরে যে খাবার আছে তাতে দিন দশেক চলবে। মেয়েটা দুপুর বেলা বাবাকে ছাড়া খেতে বসে না। বেলে মাছ খুব পছন্দ করে মিনা। মিনা আজকাল কথা শিখেছে খুব। বাবা এলেই দুনিয়ার সব প্রশ্ন শুরু

করে। যেন বাবার জন্য মাথায় জমিয়ে রাখে সব। বছর খানেক আগে দাদা মারা গেছে। এরপর থেকে মেয়েটা জটিল সব প্রশ্ন করতে শুরু করেছে। সব প্রশ্নের উত্তর হাফিজুলের নিজেরও জানা নেই।
আজ রাত থেকে হাফিজুলের ট্রাকের চাকরি শুরু।
টানা তিন চার দিন গাড়িতে থাকতে হবে। হাত খরচের জন্য জাহানারার হাতে একটা একশ টাকার নোট দেয় হাফিজুল।
বাবা মা মন খারাপ করলে মিনা বুঝতে পারে। তখন সে কোন প্রশ্ন করে না। কিন্তু তার চোখ দেখে বুঝা যায় তার মনে অনেক প্রশ্ন। মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে মনটা খুশীতে ভরে উঠে।
-কিরে মা আইজ তুই কিছু কস না ক্যা ?
-তোমার মন ভালা অইলে কমু বাবা।
-আমার মন ভালা আছেরে মা, ক তুই কি কইবি।
-আইচ্ছা বাবা, দাদাজানের লগে মোবাইলে কথা কওয়া যায় না?
-নারে মা। তোর দাদাজান আল্লার কাছে চইলা গেছে।
-আল্লার কাছে কি মোবাইল ফোন নাই ?
-আছেরে মা, কিন্তু আল্লার কাছে মানুষ চইলা গেলে তার সাথে আর কথা কওয়ার নিয়ম রাখে নাই আল্লায়।
-আল্লা কই থাকে ?
-আল্লা আকাশের উপরেও থাকে আবার পাতালেও থাকে। আল্লা সবখানে থাকে।
-আল্লা মানুষরে কেন নিয়া যায়?
-মানুষ আল্লার কাছ্ থেইক্যা আসে সেই জন্যই আল্লার কাছে ফিইরা যায়রে মা।
জাহানারা একটা পাতলা কম্বল হাফিজুলের হাতে তুলে দেয়। বাবা মেয়ের কথা এখানেই থেমে যায়। রাতে বেশ কুয়াশা পরে। বেশ শীত। এই কম্বলটা গায়ে দিয়ে মাথা-কান ঢেকে গাড়ির ভিতরে বসে থাকলে বেশ আরাম হবে। গায়ে জড়িয়ে শুয়ে থাকতেও পারবে।

কফিলউদ্দিন বেশ দক্ষ ট্রাক চালক। তার গাড়ির চাকার নীচে কোন দিন একটা গরু ছাগল পরেনি। খুব দরদী মানুষ। লালন সাঁই এর ভক্ত। হাফিজুলকে দেখে তার বেশ পছন্দ হয়েছে। সিগনাল, ওভারটেক, ডান - বাম সব কিছু বুঝিয়ে দেয়। কয়েক দিন একটু সমস্যা হলেও সব ঠিক হয়ে যাবে বলে আস্বস্ত করে।
- দেশের অবস্থা বেশী সুবিধার না একটু চোখ কান খোলা রাখবা, এই বলে সতর্ক করে । আল্লাহ ভরসা। পেটের জ্বালা তো আর দেশের অবস্থা বুঝে না। তার তিন বেলা নিয়ম মাফিক চাই।
সুন্দরগঞ্জ বাজার থেকে বেগুন আর কপি ভর্তি ট্রাক রাত এগারোটায় ছাড়ে। ঢাকা যাবে। প্রচন্ড কুয়াশায় কয়েক ফুট দূরে দৃষ্টি আটকে যায়। গাড়ির গতি খুব কম। রাতে চালকদের ঘুম পায় বলে কেউ কেউ গান বাজায়। কফিলউদ্দিন নিজে গান গায়। নতুন সহকারীকে কাজে মন লাগাতে প্রথম দিন একটু বেশী খাতির করে কথা বলছে। গান গেয়ে শুনিয়ে অর্থ বুঝিয়ে দিচ্ছে। কফিল গাইছে-
ওরে... হাড়ের ঠুনি, চামড়ার ছানি...
হাড়ের ঠুনি, চামড়ার ছানি বানাইয়াছে কি সুন্দর
সে ঘরেনি বাস করে তোর ঘরের কারিগর
ওরে বানাইয়া রঙমহল ঘর...
সে ঘরেনি বাস করে তোর ঘরের কারিগর...
-বুঝছ মিয়া গানে কি কইছে? নতুন সাগরেদকে বলে কফিল।
-না উস্তাদ কিছুই বুঝি নাই।
-আরে মিয়া এইডা বুঝলানা ? এইযে তোমার শরিলডা, হাড্ডি মাংসের শরিল। এইডা মনে করো একটা ঘর। এই ঘরে আছে তোমার অন্তর। এই ঘরটা কে বানাইছে?
-আল্লায় বানাইছে উস্তাদ।
-হ্যা, এইতো বুঝছ। তাইলে আল্লা হইলো এই ঘরের কারিগর। ঘরের কারিগর বাস করা মানে কি? মানে হইলো দমে দমে আল্লার নাম নেওয়া। সব সময় আল্লার নাম স্বরণ করবা... বাকিটা শোনো...

ঘরের আট কুঠুরি নয় দরজা হয়,
আঠারো মুকামের মানুষ আঠারো জন রয়
ওরে রবি শশী দুইটি বাতি...
ওরে রবি শশী দুইটি বাতি জ্বলিতেছে নিরন্তর
সে ঘরেনি বাস করে তোর ঘরের কারিগর...

গাইতে গাইতে কফিল গানের মধ্যে ডুবে গেছে। রাত তখন তিনটা বাজে। গাড়ি বগুড়া পার হয়ে এসেছে ঘন্টা খানেক আগে। সামনে একটা বাঁশবন তার একটু দূরেই খাবার হোটেল। সেখানে দুজনে খাবার খেয়ে নিবে। বাঁশবন পার হওয়ার সময় কোন কিছু বুঝে উঠার আগেই একটা আগুন ছুটে আসে ট্রাকের ক্যাবিনের ভিতরে। ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পাশের ধানক্ষেতে উল্টে পরে। রাতে দূর দূরান্ত থেকে লোকজন ছুটে আসতে একটু দেরী হয়। পেট্রোল বোমার আগুন নিভাতে সক্ষম হয় কিন্তু ততক্ষণে যা ঘটার ঘটে গেছে।

শেরপুর থানার বারান্দায় সাদা কাপড়ে ঢাকা দুটি লাশ পরে আছে। দুপুর থেকে কফিলের বউ বাচ্চা এসে কান্নাকাটি করছে। কফিলের স্ত্রী বার বার স্বামীর লাশটি চিনতে চেষ্টা করছে। পারছে না। হারের উপরে পোড়া মাংসের আবরণ ছাড়া কিছু নেই। সন্ধ্যার পর পুলিশ লাশ মর্গে পাঠিয়ে দিবে। খবর পেয়ে জাহানারা এসে পৌছতে অনেক দেরী হয়। দিগন্তে সূর্যটা তখন আগুনের রঙ ধরেছে। কিছুক্ষণ পর এই শক্তিধর সূর্যটা দিগন্তে হারিয়ে যাবে। তারপর পৃথিবীতে নেমে আসবে অন্ধকার। অথচ পৃথিবীর মায়ায় সূর্যটা বার বার ফিরে আসে নতুন আলো নিয়ে। জাহানারার জীবনে আলো ফিরে আসার আর কোন সম্ভাবনাই রইলো না। জাহানারার জীবনে আর কখনো ভোর হবে না। স্বামীর লাশ সনাক্ত করতে জাহানারার সময় লাগেনি। হাফিজুলের বাম হাতের আঙ্গুলে পোড়া মাংসের সাথে তখনো আটকে ছিলো সোনার আংটি।

ফাহমিদ ইসলাম
আবুল-এর কুকুর ও শেয়াল

গত বছর বইমেলা থেকে ফেরার পথে রাস্তায় এক টুকরো দমড়ানো কাগজের দলা পেয়েছিলাম। ওটা একটা হাতে লিখা Script ছিলো বলে মনে হয়েছিলো, যদিও অসম্পূর্ণ ছিলো লেখাটা। অন্য মনস্ক ভাবে খানিকটা পড়েই রীতিমত পুলকিত অনুভব করেছিলাম, কেননা কোথায় যেন অদ্ভুত মিল আছে আমার কিছু অভিজ্ঞতার সাথে । ছবি তুলে কিংবা Scan করে দেবার মতো অবস্থা ছিল না শত জীর্ণ ঐ কাগজটার, তাই যে টুকু উদ্ধার করা গেছে সেটাই এখানে হুবহু তুলে দেবার ইচ্ছাটা সংবরণ করতে পারলাম না।

(এই করতেই কেমন এক বছর চলে গেলো ...

===

......দেরিতে হইলেও আবুল জানিয়াছিল যে, কেবল মাত্র আবুল হইয়া জীবন ও জীবিকা নির্বাহ করা তাহার জন্যে নির্ঘাত বেসম্ভব হইবে। জীবিকার জন্যে তাহাকে হইতে হইবে শেয়াল অথবা স্রেফ কুকুর । তবে প্রথম জীবনে আবুল একজন গর্বিত আবুল হইয়াই শুরু করিয়াছিল তাহার দাসত্বের জীবিকা। কেননা প্রায় ১৬/১৭ বছরের প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষন তাহার মেধা ও শ্রমের প্রতি এক ধরনের আবুলীয় গর্ব ও আস্থার জন্ম দিয়াছিল। অবশ্য কিছুদিনেই আবুল টের পাইয়াছিল-এই কুকুর অথবা শেয়াল হইতে আদতেই কোনও প্রশিক্ষন এর দরকারই ছিল নাহ...।

যাহা হউক, বাস্তবিক জীবনে উন্নত রুটি রূজির প্রয়োজনে আবুল বেশ কিছু দেশী ও বিদেশী প্রতিষ্ঠানে তাহার দাসত্ব বিক্রির সুবাদে কুকুর আর শেয়ালের সমীকরণটি আবিষ্কার করিয়াছিল। দেশী প্রতিষ্ঠানে সাফল্যের জন্যে কুকুরের ন্যায় অনুগত হইতে হয়। তাহারা মুলত কুকুর পোষেন, কুকুরে ন্যায় অন্ধ প্রভুভক্ত বিশ্বস্ততাই সেখানে স্থায়ীত্বতা ও উন্নতি আনিয়া দেয়। মেধা ও যোগ্যতার ব্যপারটা মাঝে মাঝে উঁকি দিলেও, বিশ্বস্ততার তুমুল লেজ নাড়ানির সামনে অন্য সমস্ত কিছুই ম্লান হইয়া উঠে ! বুদ্ধিদীপ্ত ভৃত্যকে মালিক পক্ষ মুলত অপছন্দ করেন, আর তাই স্বল্প মেধার অবনত মস্তক ভৃত্য হইয়া উঠেন তথাকথিত ছায়া প্রভু !

কেতাদুরস্ততার (Smartness) মানদন্ডে এইসব প্রতিষ্ঠানে খানিকটা নিম্ন শ্রেনীর হইলেও সোজা বাংলায় যাহাকে খ্যাত (ক্ষ্যত) বলে সেই দৌড়ে তাহারা যথেষ্ট আগায়াই ছিল। দীর্ঘদিনের মধ্যবিত্ত জীবন যাপনে অবদমিত অদক্ষ অতি আকাঙ্ক্ষা কোনো কোনো মানুষের ভিতরে এক ধরনের বিষবাষ্প তৈরি করে। তবে মজার ব্যপার হইল ঐ দীর্ঘ অদক্ষ্য মধ্যবিত্ত জীবন, চিত্তকেও মধ্যম করিয়া সেই বিষবাষ্পের বিস্ফোরিত উদগীরনের সাহসকেও চিরতরে গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলে বৈকি। কিন্ত ঐ বিষবাষ্প নানা উপায়ে, ছলনায়, বুদবুদ রুপে বাহির হইতেই থাকে। আবুল এইরুপ কাউকে কাউকে দেখিয়াছিল সেই কুকুর জীবনে। যাহারা সামনাসামনি অতিকষ্টে হাস্যজ্জল থাকিলেও পেছন ফিরিলেই সেই বুদবুদাক্রান্ত হইয়া দুর্বল ছুরিকাঘাতে জরজরিত করিত। ইংরেজি ভাষায় এদের Back-Stabber বলে শুনিয়াছি !!

বিদেশী প্রতিষ্ঠানে আবুলের অভিজ্ঞতা বরং বেশী। এখানকার ব্যপারটা আবুলের কাছে একটু ভিন্ন ও চমকপ্রদ মনে হইয়াছিল। এখানে প্রভু ভৃত্য সকলেই একেকটা ধূর্ত শেয়ালের ন্যায়! কিছু প্রচলিত সমিতিবদ্ধ শব্দের আড়ালে তাহারা কেবল নিজেদের পুচ্ছদেশ ঢাকিয়া অন্যের পুচ্ছের পেছনে লাগিয়া

থাকে। সর্বত্র নেতৃত্তের ফেনা ভরা মুখস্থ বুলি আওড়াইলেও ইনারা মুলত নেতা এবং ব্যবস্থাপক এর প্রাথমিক পার্থক্যেই আটকাইয়া রহেন। ইনারা সকলেই অগচরে সকলের গুষ্টি উদ্ধারে সর্বদা সচেষ্ট।

ইহা প্রথম দিকে আবুলকে যারপরনাই ধাধায় ফেলিয়াছিল। তাহার অনুপস্থিতিতে তাহার গুষ্টিও যে ইনারাই উদ্ধার করেন তাহা বুঝিতে আবুলের যথেষ্ট সময় লাগিয়াছিল। সত্যিকারের মালিক যেহেতু অনুপস্থিত, কেতাদুরস্থ ভৃত্যরা কেবল নিজেদের সীমিত ভাগ টুকু সারিয়া বাকি সময় নিজেদের ব্যবসা অথবা ব্যবসা সংক্রান্ত স্বপ্নে মশগুল থাকেন….. (বাকি লাইন গুলো উদ্ধার করা সম্ভব হয় নাই)

প্রবন্ধ

কাজী মিরা
নববর্ষে মিষ্টিমুখ

বাংলা নববর্ষে 'মিষ্টিমুখ' একটি উল্লেখযোগ্য দিক। বর্ষবরণে পরিবারের সবাইকে নিয়ে মিষ্টিমুখ না করলে নববর্ষ যেন সম্পূর্ণ হয় না। আমরা ছেলেবেলায় জনপ্রিয় মিষ্টি বলতে রসগোল্লাকেই বুঝতাম, কিন্তু বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আরও অনেক মিষ্টি আছে, যা অনেক জনপ্রিয় এবং যা দিয়ে নববর্ষে মিষ্টিমুখ করানো হয়। যেমন- ময়মনসিংহ-এর মুক্তাগাছার মন্ডা, নাটোর-এর কাঁচাগোল্লা, টাঙ্গাইল-এর পোড়াবাড়ির চমচম, কুমিল্লা-এর রসমালাই, নওগাঁ-এর প্যারা সন্দেশ, যশোর-এর জামতলার মিষ্টি ইত্যাদি।

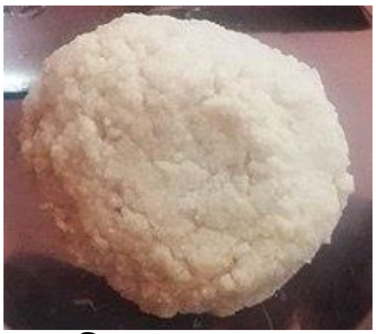
ময়মনসিংহ-এর মুক্তাগাছার মন্ডা

নাটোর-এর কাঁচাগোল্লা

টাঙ্গাইল-এর পোড়াবাড়ির চমচম

কুমিল্লা-এর রসমালাই

নওগাঁ-এর প্যারা সন্দেশ

যশোর-এর জামতলার মিষ্টি

প্রতিভা চৌধুরী
বৈশাখের গান

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-এর কালজয়ী সেই গানের সুর আমরা ভুলতে পারি না-

‘এসো হে বৈশাখ এসো এসো’

নববর্ষের প্রভাতে প্রতি বছর বর্ষবরণে আমরা এ গান পরিবেশন করে থাকি । এ গান শুধু বর্ষবরণের জন্য নয়, বরং এ গান নব প্রভতের নব জাগরণের গান। বৈশাখের ঋতুবন্দনা করে রবিঠাকুর এটি রচনা করেছিলেন, কিন্তু এ গানের মধ্য দিয়ে প্রকৃতির সাথে মানবের যে মিলন, তা তিনি প্রকাশ করেছেন। ‘ছায়ানট’এ গান দিয়ে শুরু করেছিল বর্ষবরণের। সেই ধারাবাহিকতায় রবি ঠাকুরের এই কালজয়ী গানটি নববর্ষে পরিবেশন করা হয়।

এসো হে বৈশাখ এসো এসো
তাপসনিঃশ্বাস বায়ে মুমূর্ষুরে দাও উড়ায়ে
বৎসরের আবর্জনা দূর হয়ে যাক ॥

যাক পুরাতন স্মৃতি, যাক ভুলে যাওয়া গীতি
অশ্রুবাষ্প সুদূরে মিলাক ॥

মুছে যাক গ্লানি, ঘুচে যাক জরা,
অগ্নিস্নানে শুচি হোক ধরা।

রসের আবেশরাশি শুষ্ক করি দাও আসি,
আনো আনো আনো তব প্রলয়ের শাঁখ।
মায়ার কুজ্ঝটিজাল যাক দূরে যাক ॥

নাটক

র. আমিন
বৈশাখী মেলা

(চরিত্র - হাস, হাসা, হাসি, হাসু ও ফেরিওয়ালা)

(নববর্ষের সকাল, হাস নববর্ষের শুভেচ্ছা জানাতে থানায় ফোন করল)

হাস : হ্যালো ! আস্‌সালামুআলাইকুম, ওসি সাহেব ? শুভ নববর্ষ !
: আপনার ডায়েলকৃত নাম্বারে সংযোগ প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে না। অনুগ্রহ করে কিছুক্ষণ পর আবার চেষ্টা করুন, ধন্যবাদ।
(পুনরায় হাসা নববর্ষের শুভেচ্ছা জানাতে থানায় ফোন করল)
হাসা : হ্যালো ! আস্‌সালামুআলাইকুম, ওসি সাহেব ? শুভ নববর্ষ !
: আপনি যে নাম্বারে ফোন করেছেন,তা এই মূহুর্ত্যে বন্ধ আছে ।
হাসা : ধ্যাত্ । (হাসা ফোনের লাইন কেটে দিল)
(কিছুক্ষণ পর হাসি নববর্ষের শুভেচ্ছা জানাতে ফোন করল এম.পি সাহেবের কাছে)
হাসি : হ্যালো ! আস্‌সালামুআলাইকুম, এম.পি সাহেব ? শুভ নববর্ষ !
: আপনার কাঙ্খিত নাম্বারটিতে এই মূহুর্ত্যে সংযোগ দেয়া সম্ভব হচ্ছে না, একটু পরে আ-বার ডায়েল করুন ।
(কিছুক্ষন পর হাসু নববর্ষের শুভেচ্ছা জানাতে পুনরায় ফোন করল এম.পি সাহেবের কাছে)
হাসু : হ্যালো ! আস্‌সালামুআলাইকুম, এম.পি সাহেব ? শুভ নববর্ষ !
: দুঃখিত, আপনি ভূ-উ-ল নাম্বারে ডায়েল করেছেন ।
হাসু : ধ্যাত্ । (হাসু ফোনের লাইন কেটে দিল)
হাসা : মেলায় যাবি ?
হাসু : তুই কি পাগল হয়েছিস ?
হাস : কি ? ঘরে কি ছাগল ঢুকছে ?
হাসি : ধ্যাৎ ! ঠসা কোথাকার।
হাস : কি ? ঘুষা মারবা নাকি ?

(হাসা লাউ এনে গান ধরল "সাধের লাউ বানাইলো মোরে বৈরাগী" ....)
(গান শেষ হলে পুনরায় হাস ধেরে গলায় গান ধরল আর হাসি হাড়ি-পাতিল নিয়ে বাজনা শুরু করল)

হাস : এলো এলোরে বৈশাখী ঝড়, এলো এলোরে.....
হাসি : হাস ভাইয়া, তোমার ধেরে গলাটা যেমন-তেমন, আমার বাজনাটা কিন্তু খুব সুন্দর..
হাস : ঐ বৈশাখী ঝড়, এলো এলো হাস-হাসা-হাসি-হাসু এর জন্য....
হাসি : হাস ভাইয়া, তোমার ধেরে গলাটা যেমন-তেমন, আমার বাজনাটা কিন্তু খুব সুন্দর..
হাস : (গান থামিয়ে) ধ্যাৎ ! আমার ধেরে গলা নাকি ? এলো এলোরে বৈশাখী ঝড়, এলো এলোরে....
হাসি : হাস ভাইয়া, বৈ-বৈ-বৈশাখী মেলায় যা-যা-যাবে না ?

হাস : ঐ বৈশাখী ঝড়, এলো এলো হাস-হাসা-হাসি-হাসু এর জন্য...
হাসি : হাস ভাইয়া, হা-হা-হালখাতা দেখতে যা-যা-যাবে না ?
হাস : এলো এলোরে বৈশাখী ঝড়, এলো এলোরে...
হাসি : হাস ভাইয়া...
হাস : (গান থামিয়ে) হাসি আপু ..
হাসা : মেলায় যাবি না ?
হাসু : চলো যাই।
হাস : যা-যা-যাবো।
হাসু : কি রে হাসা- হাসি ? কোথাও যেন বাচ্চা কাঁদছে, যা বাইরে গিয়ে দেখে আয় তো...
(হাসি দৌড়ে যায় গেটের দিকে, কিছুক্ষনের মধ্যে ফিরে আসে)
হাসা : ১ নম্বর, ২ নম্বর.৩ নম্বর- সব ফ্লাটে খোঁজ করেছি, কোথাও কোনো বা-বা -বাচ্চা কাঁদছে না।
হাস : কোথাও যেন বাচ্চা কাঁদছে- "জল পড়ে, পাতা নড়ে"
(বাইরে থেকে আওয়াজ হবে - জল পড়ে পাতা নড়ে),
যা বাইরে গিয়ে দেখে আয় তো...(হাই তুলে)
(হাসি আবার দৌড়ে যায় গেটের দিকে, কিছুক্ষনের মধ্যে ফিরে আসে)
হাসি : সিকিউরিটি গা-গা-গার্ড ঘুমাচ্ছে আর নাক ডা-ডা -ডাকছে "জল পড়ে, পাতা নড়ে,
(হাসা আওয়াজ করবে- জল পড়ে, পাতা নড়ে)
হাসি : মেলায় যাবি না ? (হাই তুলে)
সবাই : চল যাই। (সবাই মেলার দিকে যেতে থাকল)
(সবাই যেতে যেতে গাইতে থাকল -মেলায় যাইরে, মেলায় যাইরে----মেলাই যাইরে, মেলায় যাইরে--)

(যেতে যেতে রাস্তার পাশে মাছের ফেরিওয়ালার সামনে এসে দাড়ায় সবাই)

হাসি : শুভ নববর্ষ, নানী।
ফেরিওয়ালা : শুভ নববর্ষ, নাতি।
হাসা : ইলিশ মাছ কত করে কেজি নানী ?
ফেরিওয়ালা : ৫,০০০ টাকা।
হাসু : (আশ্চর্য হয়ে) কি কইলেন ?
ফেরিওয়ালা : শোন নাতি, প্রত্যেক নববর্ষে জিনিসের দাম বারে তো তাই।
হাসা : আচ্ছা, আপনার সাথে এত কাজের মানুষ কেন ? আগে না দেখেছিলাম ১ জন এখন দেখছি ৩ জন, ব্যাপার কি ?
ফেরিওয়ালা : শোন তাহলে আসল কথা, জিনিষ পত্রের দাম যত বাড়ে, আমার কাজের মানুষের সংখ্যা তত বাড়ে।
হাসি : ওরে বাবা !
হাস : ইলিশ মাছের কেজি যেন কত কইলেন ?
ফেরিওয়ালা : ১০,০০০ টাকা কে.জি।
হাস : কি ?
ফেরিওয়ালা : হ্যা, কথা যত বেশী বলবা, জিনিষের দামও তত বাড়াবো।
হাস : অ্যাঁ !

(সবাই একসাথে আবার গান গাইতে গাইতে মেলায় ঢুকল)

হাসি : হাস ভাইয়া, বাঁশি কিনে দাও। (বাঁশি সামনে দেখে হাসি আবদার ধরে)
হাস : এই নে।
(বাঁশি কিনে হাস হাসির হতে দেয়, উল্টা দিকে থেকে এসে একজন হাসিকে ধাক্কা দেয়, সাথে সাথে হাসির পা কলার খোসার উপর পড়লে হাসি পড়ে যায় মাটিতে)
হাসি : উঁ-আঁ -উঁ-আঁ। (আস্তে আস্তে উঠে দাড়াঁয় হাসি,সবাই দৌড়ে এসে হাসিকে ধরল)
হাস : কিভাবে তুই পড়ে গেলিরে হাসি।
হাসি : উঁ-আঁ -উঁ-আঁ। একটা লোক এসে আমায় ধাক্কা দিল, আর অমনি আমার পা কলার খোসার উপর পড়লে আমি মাটিতে পড়ে যাই।
হাসা : হাসু আপু, হাওয়াই মি-মি-মিঠা খাব। (হাওয়াই মিঠা সামনে দেখে হাসা আবদার ধরে)
হাসু : চোপ! (হাসু চিৎকার করে ওঠে)

(হাসা ভয়ে প্রসাব করে দেয়, প্যান্ট ধরে কিছুক্ষন নীরব থাকে)

হাসু : এই হাসা -তোর কি হইছেরে তুই প্যান্ট ধরে আছিস কেন ?
হাসা : আমি হাসু আপুর ধমকে ভ-ভ-ভ য়ে প্রসাব করে দি-দি দিয়েছি।
হাসু : হায় হায়! (মাথায় হাত দেয়) চল তাড়াতাড়ি চল বাসায়।
হাসা : উঁ-আঁ -উঁ-আঁ (শরীর নাড়াবে হাসা)
হাসু : কি হয়েছে ভাইয়া ?
হাসা : ধর-ধর-ধর (প্যান্টের পকেটে কিছু একটা ধরে হাসা মেলায় দৌড়াতে থাকবে)
ধর-ধর-ধর (হাসা দৌড়াতে থাকবে)
হাসু : কি হয়েছে ভাইয়া ?
সবাই : ধর-ধর-ধর (সবাই দৌড়াতে থাকবে)
হাসা : শালা, ধরা গেলো না (হাসা থেমে যায়)
সবাই : কি হয়েছে ভাইয়া ?
হাসা : আরে, আমার প্যান্টের ভিতরে ইদুর ঢুকে ছিলো....
সবাই : হাঁ- হাঁ- হাঁ মেলার ইদুর !! (সবাই হেসে ওঠে)

(সবাই মেলা ছেড়ে বাসার দিকে এগুতে থাকে)

ফটোগ্রাফি

শাহরিনা চৌধুরী
বৈশাখী ফটোগ্রাফি